ছোট্ট প্রতিবেদন

বিদ্যুৎ চক্রবর্ত্তী

বিশ্বভারতীর কদর্যরূপ আমি দেখিয়াছি। জানিনা, আজ গুরুদেব থাকলে এইভাবে বলতেন কিনা? তবে, '*চারিত্রপূজা*' (১৮৯৫) বা সজনীকান্ত দাসের '*কর্মী রবীন্দ্রনাথ*'(১৯৩৭) পড়লে মনে হয়, কবি এইভাবে নিজের অসহায়তা প্রকাশ করতেন। সবাই ভাবতে ভলোবাসেন যে বিশ্বভারতী এই প্রতিষ্ঠানের উষালগ্নে যা ছিল, আজ ১০০ বছর বাদে তাই থাকবে। অনেকে গুরুদেবের ১৯১১ সালের আশ্রম সংগীতের বিবরণ শুনে দুরাশা করেন, যে ১০০ বছর অতিক্রান্ত হবার পর সেই খোলামেলা শান্তিনিকেতন থাকবে। অথচ এটা কেউ ভাববার অবকাশ পান না যে ১০০ বছরে শান্তিনিকেতন সেই স্নিগ্ধ গ্রাম নেই। সেখানে কাঁচা বাড়ির পরিবর্তে হয়েছে বড় বড় পাকা ইমারত। যার মালিক অনেকেই নিজেদের তথাকথিত রাবিন্দ্রিক বা আশ্রমিক বলে পরিচয় দেন, কলাটা-মূলোটা পাবার জন্য। তখন যাতায়তের অন্যতম বাহন ছিল গরুর গাড়ি, আজ মোটর গাড়ির আধিক্য কার না চোখে পড়ে?

উপাচার্য হিসেবে তিন বছরের অভিজ্ঞতা আমাকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে। আমার আত্মজীবনী, যা আমি লিখছি, তা অনেক বেশী পাঠক পড়বেন - আমার দৃঢ় বিশ্বাস। প্রথমত, বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীদের যে আক্রমনাত্মক ব্যবহার আমরা দেখলাম তা অকল্পনীয়। রাবিন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের ভাষা কি সত্যিই বাঙালী সমাজের অবক্ষয় নির্দ্দেশ করে না। আমাদের শিক্ষক বন্ধুরা তাই বিলাপ করছেন যে তাঁরা একেবারেই বিফল। গত ২১শে মার্চ ভাষা ভবনে যে তাণ্ডব হলো তার হোতা কে ছিলেন জানিনা। তবে, শিক্ষকদের অনেকেই আমার কাছে বলেছেন যে "স্যার আমরা দুধকলা দিয়ে বিষধর সাপ পালন করেছি।" তাঁরা আরও বলেন যে এ থেকে বোঝা যায় যে পাঠভবন এবং শিক্ষাসত্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তাঁরা কোনরকম সংস্কার দিতে পারেন নি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় কারণ কবিগুরুর উদ্দেশ্য ছিল সভ্য মানুষ বানানো। কিন্তু যে ধরনের ভাষা তাঁদের শুনতে হলো বা যে ধরনের ব্যবহারের সম্মুখীন

তাঁরা হলেন তা বোধ হয় কোন শিক্ষাগুরুর অভিজ্ঞতায় একেবারেই অকল্পনীয়।

বিশ্বভারতীতে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। বাপ-মা-বোনকে নিয়ে অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করা সংস্কারের মধ্যে পড়ে। যদি কেউ প্রতিবাদ করেন তবে তাঁকে আক্রমন করার জন্য কবির ভাষায় "অনবরত ছুড়িতে শান দিয়ে যাচ্ছে যাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হচ্ছে বা হবার সম্ভাবনা সমূহ।" এই পরম্পরার কোন ছেদ নেই। গুরুদেব বহুবার এর সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভিন্ন ভাবে অপদস্থ হয়েছিলেন তা তো ইতিহাস বলে। অপদস্ত হয়েছিলেন আরো অনেক উপাচার্য। এটা নাকি বিশ্বভারতীর রীতি। তাই শোনা যায়, অধ্যাপক অম্লান দত্ত মহাশয় (যিনি উপাচার্য ছিলেন) বলেছিলেন যে এতগুলো পাজি একজায়গায় কি করে সমবেত হলো। এখানে যে কোন আন্দোলনে অভদ্রতার চূড়ান্ত হয়। কি ছাত্র-আন্দোলন, কি কর্মী আন্দোলন। এখানে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কোন আলোচনার সুযোগ থাকে না। হয় দাবী (কখন অযৌক্তিক) মেটানোর দাবী। একমাত্র রাস্তা - তালাবন্ধ করা, গায়ের তাকত দেখিয়ে, দাবী মেটানোর অদম্য প্রচেষ্টা। এর ফলে থাকে না কোন সীমারেখা, থাকে না কোন সংস্কার, থাকে না বিশ্বভারতীর কোন মান-মর্যাদা। যারা বিশ্বভারতীর ধারক ও বাহক তাঁরাও বিফল হন হয়তবা কোন ভয় বা ভীতি থেকে। বা, দায়িত্ব নিতে চান না যদিও একথা সবার ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয়।

কে বিশ্বভারতীকে এই অবক্ষয় থেকে বাঁচাবেন। উপাচার্য আসেন একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। যাঁরা বিশ্বভারতীর সাথে সদাই যুক্ত (শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মীবৃন্দ, এবং যাঁরা সঠিক অর্থে রাবিন্দ্রিক এবং আশ্রমিক) তাঁদের দায়িত্ব কোন অংশেই কম নয়। তা না হলে নিকট ভবিষ্যতে বিশ্বভারতী যে শুধুমাত্র ইতিহাস এই সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

একটা গল্প বলে শেষ করব। তিনজন উপাচার্য সমস্যায় জরাজীর্ণ। তারা গেছেন ভগবান শিবের কাছে। এই তিনজন উপাচার্যের মধ্যে একজন বিশ্বভারতীর। দুজন উপাচার্যকে ভগবান একটা সময়সীমা দিলেন যার মধ্যে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সব সমস্যার সমাধান হবে। যখন বিশ্বভারতীর উপাচার্য গেলেন তখন ভগবান নিজেই কাঁদতে লাগলেন, এবং কান্না থামার কোন লক্ষণই নেই কারণ তিনি নিজেই জানেন না যে বিশ্বভারতীর সমস্যা কবে শেষ হবে।

গল্পটা যদিও রূপক, তবুও বলব এটা আমাদের উদ্দীপনার খোড়াক। নূতন উৎসাহে কাজ করার উৎসাহ। ভগবান শিবের দুঃখ মোচন করে, তাঁর কান্না থামাবই, কারণ আমরা গুরুদেবের আশীর্বাদপুষ্ট।

(৫৬৩ শব্দ)